সমকাল

তারিখ ..07 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫.....

ফলাফল পদ্ধতিতে বৈষম্য

পাবলিক পরীক্ষা

ড. সুলতান মাহমুদ রানা
ড. একরাম হোসেন

লেখকদ্বয় যথাক্রমে সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার হার ক্রমেই বাড়ছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা কোনোভাবেই ইতিবাচক নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাংলাদেশে এসএসসি ও এইচএসসি পাসের হার বৃদ্ধি করতে শিক্ষা বোর্ডগুলো এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বাস্তবিক অর্থে কি তাই? হয়তো না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন এত লেখালেখি, কেন এত অভিযোগ? ইদানীং আমরা লক্ষ্য করি, গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পছন্দের বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না, এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বরও অর্জন করতে পারে না, তখন শিক্ষার মান ও ফলাফল পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ উঠেছে সেগুলো মূলত সাম্প্রতিককালে। জিপিএ ৫ পেয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ১ ভাগ শিক্ষার্থীও পাস করে না তখনই এ প্রশ্নগুলো জোরালোভাবে দেখা যায়। তার মানে এই নয় যে, ফলাফল পদ্ধতি হিসেবে গ্রেডিং পদ্ধতিটিই খারাপ। এই ব্যবস্থায় অসম্ভব মেধাবী শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পাচ্ছে আবার অপেক্ষাকৃত অনেক কম মেধাবীও জিপিএ ৫ পেয়ে পরীক্ষায় পাস করছে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় যখন শতকরা এক ভাগও পাস করে না তখন শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ১৯৯১ সালে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম আমদের দেশে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং সিস্টেমে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। পরে একই পদ্ধতিতে ২০০৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় কার্যকর করা হয়। এর পূর্বে ফলাফল প্রদান করা হতো ডিভিশন বা বিভাগ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বরকে প্রথম বিভাগ, ৪৫০ নম্বরকে দ্বিতীয় বিভাগ, ৩৩০ নম্বরকে তৃতীয় বিভাগ এবং স্টার মার্ক নম্বরকে ৭৫০ ধরা হতো। প্রতি বিষয়ে লেটার হিসেবে ধরা হতো ৮০ নম্বরকে। যে কোনো বিষয়ে লেটার মার্ক পাওয়া খুব সহজ ছিল না। মেধাবী শিক্ষার্থী তার ফলাফলের মাধ্যমেই নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারত। এখন যেটি সম্ভব নয়।

বিভিন্ন সময়ে কয়েক বছর অন্তর পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফলে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ এক সময় (১৯৯৩-১৯৯৫) এসএসসি পরীক্ষায় নির্দিষ্টসংখ্যক এমসিকিউ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার কারণে শিক্ষার্থীরা ওই প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই ১০০ ভাগ এমসিকিউ প্রশ্ন কমন পাওয়ার সুযোগ ছিল। এক্ষেত্রে সহজেই একজন শিক্ষার্থী ভালো ফল করতে পারত। আবার ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এমসিকিউ পরীক্ষায় নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করলেই ১০০ ভাগ কমন পাওয়ার নিশ্চয়তা তুলে দেওয়া হয়। পরিবর্তন আসে ফলাফলে। ফলাফল বিচারে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন কঠিন হয়ে যায়। কারণ তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার ফলাফলে পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। পরে ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় যখন গ্রেডিং পদ্ধতি যখন চালু হয় তখন জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে হঠাৎ করে জিপিএ ৫ এর পরিমাণ কয়েকগুণে বেড়ে যায়। তাহলে কী আগের তুলনায় পরবর্তীতে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়? উল্লেখ্য যে, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর বছরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারাদেশে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ৭৬ জন (২০০১)। এরপর ৩২৭ জন পায় ২০০২ সালে, ১ হাজার ৩৮৯ জন পায় ২০০৩ সালে, ৮ হাজার ৫৯৭ জন পায় ২০০৪ সালে, ১৫ হাজার ৬৩১ জন পায় ২০০৫ সালে, ৩০ হাজার ৪৯০ জন পায় ২০০৬ সালে, ৩২ হাজার ৬০ জন পায় ২০০৭ সালে, ৫২ হাজার ৫০০ জন পায় ২০০৮ সালে, ৬২ হাজার ৩০৭ জন পায় ২০০৯ সালে, ৮২ হাজার ৯৬১ জন পায় ২০১০ সালে, ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন পায় ২০১১ সালে, ৮২ হাজার ২১২ জন পায় ২০১২ সালে, ৯১ হাজার ২২৬ জন পায় ২০১৩ সালে, ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬ জন ২০১৪ সালে। আর কয়েকদিন আগে প্রকাশিত এ বছরের এসএসসিতে জিপিএ ৫ এর হার কিছুটা কমলেও সংখ্যাটি ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১। ঠিক একইভাবে লক্ষ্য করা যায় এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর বছরে ২০০৩ সালে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থী। ২০১৩ ছিল ৫৮ হাজার ১৯৭ জন এবং ২০১৪ সালে ৭০ হাজার ৬০২ জন। এভাবে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের দেশে জিপিএ ৫ পাওয়ার চিত্র। এই চিত্র দেখে উল্লসিত সবাই, তবে উদ্বেগও বাড়ছে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে।

বর্তমানে গ্রেডিং পদ্ধতি শুধু এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাতেই চালু নেই, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়েও চালু হয়েছে। তবে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মোট মান জিপিএ ৫, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট মান জিপিএ ৪ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় মোট মান জিপিএ ৫ ধরা হয়েছে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত জিপিএ সমান হলেও পরীক্ষার ভেদে মূল্যমান সমান হয় না। কেননা স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার প্রাপ্ত জিপিএ ৪ এবং স্নাতক (পাস) জিপিএ ৪ এক নয়। এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস), মাস্টার্স সব পরীক্ষায়ই প্রাপ্ত জিপিএ ৩.৫ হলেও সব পরীক্ষার মূল্যমান কিন্তু সমান নয়। কেননা, কোথাও স্কেল ৫ আবার কোথাও ৪ রয়েছে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আমাদের দেশের চাকরির বিজ্ঞাপনদাতাও বিপদে পড়েন। আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা উল্লেখ করতে অনেক ভাবতে হয়। পাশাপাশি সনাতনী পদ্ধতির সঙ্গে এর সম্পর্কও স্থাপন করতে হয়। তা না হলে শিক্ষার্থীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের গ্রেডিং পদ্ধতি চালু থাকা দরকার। এক্ষেত্রে প্রতি বছর অন্তর শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন না এনে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর লক্ষ্যে সবার জন্য প্রযোজ্য অনন্য এবং বাস্তবনির্ভর ফলাফল পদ্ধতির প্রয়োগ অনিবার্য।

শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ উঠেছে সেগুলো মূলত সাম্প্রতিককালে। জিপিএ ৫ পেয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ১ ভাগ শিক্ষার্থীও পাস করে না তখনই এ প্রশ্নগুলো জোরালোভাবে দেখা যায়। তার মানে এই নয় যে, ফলাফল পদ্ধতি হিসেবে গ্রেডিং পদ্ধতিটিই খারাপ। এই ব্যবস্থায় অসম্ভব মেধাবী শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পাচ্ছে আবার অপেক্ষাকৃত অনেক কম মেধাবীও জিপিএ ৫ পেয়ে পরীক্ষায় পাস করছে